গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১৬ এপ্রিল, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

১২ এপ্রিল কলকাতার মার্কিন প্রচারদপ্তরের সামনে এস ইউ সি আই'র বিক্ষোভ। (সংবাদ ৮-এর পাতায়)

ইরাকের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দন

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে ইরাকের গণবিদ্রোহের নায়ক ইরাকি জনগণ — যাঁরা ইরাকের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার হীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে ব্যর্থ করেছেন, মার্কিন নেতৃত্বে দখলদার সেনাবাহিনীর ঘেরাও অভিযান চূর্ণ করেছেন, সকল প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হানাদারদের দেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে দিতে হাজারে হাজারে পথে নেমেছেন — তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দেশপ্রেমিক ইরাকি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করতে মার্কিন নেতৃত্বে দখলদার বাহিনী যে বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করে কমরেড নীহার মুখার্জী ইরাকের সংগ্রামী জনগণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে সাদ্দাম হোসেনের মুক্তি দাবি করেছেন এবং বীর ইরাকি জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার জন্য দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

ইরাকে ভারতীয় সেনা পাঠাবার সাম্প্রতিক মার্কিন চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের লজ্জাজনক ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করে এ ব্যাপারে দেশের মানুষকে অতন্দ্র প্রহরায় থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বাধীনতাকামী ইরাকি জনগণের তীব্র প্রতিরোধ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ চূর্ণ

না, ইতিহাসের অন্যথা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ কোনদিনই শেষ কথা বলেনি। ইতিহাসের রশি আজও জনগণেরই হাতে। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা স্ট্যালিন বলেছিলেন, নেতা আসেন, নেতা যান, কিন্তু জনগণ থেকে যায়, তারাই ইতিহাস তৈরি করে। এ শিক্ষারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে ইরাকের মাটিতে, ইরাকের জনগণ এক নতুন ইতিহাস রচনা করছেন এবং অবশ্যই তা রক্তের অক্ষরে। বিশ্বের কোণায় কোণায় শোষিত, লুণ্ঠিত, নিপীড়িত সর্বস্ব হারানো মানুষ যে লড়াই চায়, সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের যে উচিত শিক্ষা দিতে পারার স্বপ্ন তারা দেখে, ইরাকের মাটিতে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নই যেন আজ বাস্তব রূপ পেয়েছে। তাই এই লড়াই বিশ্বের কোটি কোটি নিপীড়িত জনগণের লড়াই। হে বীর ইরাকি জনগণ, তোমরা আজ বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা নিয়েছ, প্রাণভরা আবেগ নিয়ে তোমাদের অভিনন্দন জানাই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন ও চীনের সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে যাওয়ার পর যারা ভেবেছিল, দুনিয়ায় আর কোথাও জনগণ প্রবল পরাক্রমী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, ইরাকের জনগণ তাদের সেই হতাশা বা ভুলকে প্রতিদিন ভেঙে দিচ্ছে।

মার্কিন শাসকদেরই তৈরি করা মৌলবাদী তালিবানদের দ্বারা শাসিত আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিতে পারার আনন্দে মাতোয়ারা বুশ-ব্লেয়ার জোট ভেবেছিল — ইরাককেও তারা সহজে জয় করে নেবে, মার্কিন গণতন্ত্র, ভোগবাদী ও ব্যাভিচারী সংস্কৃতির প্রলোভনে ইরাকি জনগণের মাথা নত করাবে। সর্বোপরি, ভেবেছিল শিয়া-সুন্নির মধ্যে বিভেদ উস্কে তুলে, তাদের আত্মঘাতী সংঘর্ষে ফাঁসিয়ে দিয়ে ইরাকের তেল লুটে নিয়ে যাবে আটলান্টিকের ওপারে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এখানেই হিসাবে ভুল করেছিল। ইরাকের শাসন মৌলবাদী ছিল না। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সাথে ইরাকের পার্থক্য ছিল এখানেও যে, রাষ্ট্রের কাজকর্মের সাথে সেখানে ধর্মকে মিশতে দেওয়া হয়নি, ধর্মকে রাখা হয়েছিল নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয়ে। তাই ইরাকের মাটিতে শিয়াদের সমাবেশে বীভৎস আক্রমণ ঘটে যাওয়ার পর শত চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যম একথা বোঝাতে পারেনি যে, ঐ আক্রমণ সুন্নিদের কাজ। বরং শিয়া গোষ্ঠীর মানুষ আঙুল তুলেছে আমেরিকার দিকে, একযোগে বলেছে — শত্রু আমেরিকাই। তাই আজ যখন দেখা যায়, সুন্নি অধ্যুষিত ফালুজার লড়াকু ভাইদের জন্য ত্রাণ সাহায্য যাচ্ছে শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে তখন মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যায়। প্রেরণা পাওয়া যায় ইতিহাসের আর একটি শিক্ষাকে মূর্তরূপে দেখতে

পাঁচের পাতায় দেখুন

গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য কমিটির আহ্বান

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ৯ এপ্রিল দলের রাজ্য দপ্তরে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এস ইউ সি আইয়ের মূল রাজনৈতিক বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী এবং কমরেড প্রতিভা মুখার্জী।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — এবার নির্বাচনে একটা নতুন বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করেন এমন মানুষরা এবার আমাদের বলছেন — "আপনারা দাঁড়িয়েছেন, এতে ভাল হল। না হলে আমরা কাকে ভোট দিতাম ? আপনারা দাঁড়িয়েছেন বলে আমরা ভোট দেওয়ার জায়গা পেলাম।"

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে —

আগামী ১০ মে ২০০৪ পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও মেকি বামপন্থী দলগুলি, জনগণের জীবনে কে কত সুখের বন্যা আগামী দিনে বইয়ে দেবে তারই প্রচারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নির্বাচনে জয়ের উদ্দেশ্যে এরা একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং কুৎসা ছড়িয়ে ইতিমধ্যেই একটি কলুষ বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

এদেশের মানুষ জানেন যে, নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণের রায় প্রতিফলিত হয় না। যে যেখানে শক্তিধর সে সেখানেই অর্থ এবং বাহুবলের সাহায্যে রিগিং-এর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করে। একথা আজ নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভারতবর্ষের ১০২ কোটি জনগণের মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি বেকার ও অর্ধবেকার। লক্ষ লক্ষ কল-কারখানা বন্ধ কয়েক কোটি মানুষ ছাঁটাইয়ের বলি, কয়েক লক্ষ সরকারি পদ বিলোপ ও বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্পের বলি লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। খরা-বন্যায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত, কোটি কোটি শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং শিশুমৃত্যুতে বিশ্বে এদেশ আজ শীর্ষস্থানে।

এ'রকমই একটা অবস্থায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 'ভারত উদয়' ঘটেছে এবং 'সুখানুভূতি'র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে জনগণের কোটি কোটি টাকার অপব্যয় করে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছে। একইভাবে সি পি এম সরকারি টাকায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা পৌরসভার টাকায় উন্নয়নের বিজ্ঞাপন দিয়ে এক অনৈতিক দৌড়ে সামিল হয়েছে।

আমাদের সুদৃঢ় অভিমত যে, উন্নয়ন বা অগ্রগতি এরাজ্যে বা ভারতবর্ষে যা ঘটেছে, তা দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই। সি পি এম জনগণকে তৃণমূল-বিজেপি জোটের আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে সামিল হতে বলছে। অথচ এরাজ্যে তারাও একই নীতি কার্যকরী করছে। তাই মালিকদের স্বার্থে জনগণের বিরুদ্ধে লাঠি-গুলি চালিয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করার প্রয়াসে বুর্জোয়া দলগুলি শাসিত কেন্দ্র বা অন্যান্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিচার ব্যবস্থায় গণতন্ত্র এক মরীচিকা

বছর কয়েক আগে বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল এস ইউ সি আই-এর কয়েকজন মহিলা কর্মীর শালীনতা হানির অপচেষ্টা চালিয়েছিল সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের পুলিশবাহিনী। কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্য দিনের আলোয় পুলিশের এই ঘৃণ্য আচরণে এবং সে বিষয়ে ফ্রন্ট সরকারের নির্বিকার উদাসীনতায় মর্মাহত এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কয়েকদিন পর এক নাগরিক কনভেনশনে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, পুলিশ ও প্রশাসন আজ যেভাবে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরছে, সেখানে বিচারব্যবস্থাকেই গণতন্ত্র রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টই একমাত্র ভরসা।

বস্তুতপক্ষে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে চুরি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, জুলুমবাজি সহ নানা অন্যায় আক্রমণের মোকাবিলা করে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হতে হতে গণমাধ্যমের ধারাবাহিক প্রচারে বিভ্রান্ত এদেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের অনেকেই মনে করেন, সুবিচার পাওয়ার শেষ আশ্রয়স্থল হল বিচারব্যবস্থা। সুপ্রিম কোর্ট তাদের কাছে প্রায় ঈশ্বরের মর্যাদা পায় — যদিও এ ঈশ্বর তাদের ধরা- ছোঁওয়ার বাইরে। প্রচুর অর্থ দিলে তবে সে মন্দিরের দরজা খোলে।

বিচারব্যবস্থারূপী এই পাষাণদেবতাও দুর্নীতিমুক্ত নয়। মাত্র কয়েকদিন আগে খোদ ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতি সহ আরো কয়েকজন মান্যগণ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগের ভিত্তিতে গুজরাটের একটি নিম্ন আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করে এনে এক টিভি-সাংবাদিক প্রমাণ করে দিয়েছেন, ভারতীয় গণতন্ত্রের 'অন্যতম ভিত্তি' এই বিচারব্যবস্থাটি আসলে কতটা নড়বড়ে। সংবাদে প্রকাশ, এই অভাবনীয় কাজটি করতে ওই সাংবাদিককে মাত্র ৪০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল।

সামন্ততন্ত্রের অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র ঝাণ্ডা উড়িয়ে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থাকে সেই গণতন্ত্রের অন্যতম একটি স্তম্ভ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। রাজতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচার ভাঙতে এসেছিল ক্ষমতা বিভাজন নীতি। প্রশাসন, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগ — গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই তিন বনিয়াদের মধ্যে বিচারব্যবস্থার প্রতিই মানুষের আস্থা ছিল সর্বাধিক। কারণ, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, বিচারবিভাগটি হল সকল দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। আশা করা হয়েছিল, অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে যে সমস্ত অন্যায় কার্যকলাপ দেখা যাবে, কঠোর হাতে তা দমন করবে বিচারব্যবস্থা। তাই বিচারালয়গুলিকে সেদিন 'ন্যায়ালয়' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। সেই চিন্তাধারার গতিপথে আজও বহু মানুষ সুপ্রিম কোর্টকে যাবতীয় দুর্নীতির ঊর্ধ্বে এদেশের 'উচ্চতম ন্যায়ালয়' বলে মনে করেন। কিন্তু গুজরাটের ওই ঘটনাটি সম্পর্কে সি বি আই-এর তদন্ত রিপোর্ট পড়ে সেই 'উচ্চতম ন্যায়ালয়ে'রই প্রধান বিচারপতি, ভি এন খারে যখন মন্তব্য করেন, এই ঘটনাটি ভারতীয় বিচারব্যবস্থার একেবারে মূলে আঘাত করেছে এবং এদেশে বিচারপতি ও আইনজীবীদের মধ্যে যে গোপন বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে — সেই দুর্নীতি দমন করার মতো কোনও ক্ষমতাই তাঁর হাতে নেই (দি স্টেট্‌সম্যান, ২৪-২-০৪ এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৪-৩-০৪), তখন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে কথিত ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারাটি সম্বন্ধে প্রশ্ন না উঠে পারে না।

এ ঘটনা যে শুধু গুজরাট রাজ্যের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তা নয়। স্বয়ং প্রধান বিচারপতি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, দেশের প্রায় সর্বত্রই বিচারপতি-আইনজীবী দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে (দি স্টেটসম্যান, ২৪-২-০৪)। এবং এ শুধু নিম্ন আদালতের ঘটনাও নয়। প্রধান বিচারপতি পদে থাকাকালীন জাস্টিস এস পি বারুচাও এক সময় মন্তব্য করেছিলেন যে, এদেশের উচ্চতর আদালতগুলির শতকরা ২০ ভাগই হল দুর্নীতিগ্রস্ত (দি স্টেটসম্যান, ১৭-২-০৪)।

আবার শুধু এদেশে নয়, গণতন্ত্রের 'স্বর্গরাজ্য' বলে যাদের অভিহিত করা হয়, সেই ব্রিটেন ও আমেরিকাতেও একই ঘটনা ঘটে চলেছে। সমগ্র বিচারব্যবস্থাটি সেখানে পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনীতিবিদ্‌দের দখলে। সে কারণেই ব্রিটেনে বিচারপতি লর্ড হাটনকে দিয়ে একটি সাজানো তদন্ত করিয়ে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেভিড কেলি'র আত্মহত্যার যাবতীয় দায় চাপিয়ে দিতে পেরেছেন ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যম বি বি সি'র ওপর। ইরাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টটি যে জাল, বিজ্ঞানী কেলি সে কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছিল। ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটির পৃষ্ঠপোষকতাধন্য বিচারপতি লর্ড হাটন মিথ্যা তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এ থেকে গণতন্ত্রের 'স্বর্গরাজ্যে' গণতন্ত্রের আসল চেহারাটি ফাঁস হয়ে যায়।

আমেরিকাতেও একই জিনিস চলছে। মার্কিন প্রশাসন ও বিচারবিভাগের কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। প্রধানত গরিব হওয়ায়, কৃষ্ণাঙ্গ ও হিসপানিকরা জাতিবিদ্বেষী মার্কিন প্রশাসনের ও বিচারবিভাগের কাছে নিরপেক্ষ আচরণ পায় না। বর্তমানে বিচারবিভাগের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি এতেই সীমাবদ্ধ নেই। সকলের নিশ্চয় স্মরণে আছে, গত নির্বাচনে প্রাথমিক ভাবে হেরে গেলেও কর্পোরেট মদতপুষ্ট জর্জ বুশ কীভাবে মার্কিন বিচারব্যবস্থাকে কব্জা করে বাঁকা পথে ক্ষমতার শিখরে চড়ে বসেছিলেন। সেই প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকের দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতিরোধের সামনে পড়ে নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর মার্কিন জনগণের কাছে সাধু সাজতে, ইরাক সম্পর্কে মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টের 'নিরপেক্ষ' তদন্ত করানোর নামে তড়িঘড়ি একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন। কমিশনের শীর্ষে বসিয়েছেন এমন এক বিচারপতিকে যিনি বুশ সাহেবের কৃপাধন্য হিসাবে সুপরিচিত। এই কমিশন যতদিনে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে ততদিন সেদেশে আরেক দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে রিপোর্টটা যাতে পথের কাঁটা হয়ে না দাঁড়াতে পারে — বুশ সাহেব ও তাঁর দল সে ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছেন। ফলে 'নিরপেক্ষ' বিচারের নামে সেদেশে যে আরো একটি প্রহসন ঘটতে চলেছে — একথা পরিষ্কার।

পশ্চিমী গণতন্ত্রের 'স্বর্গরাজ্য'গুলির মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষেও বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার ধারণাটি যে কত ঠুন্‌কো, নানা ঘটনায় বহুবার তা প্রমাণিত হয়েছে। এদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের বহু গণমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু অভিযোগ উঠেছে। আদালতে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু কোন সময়েই বিচারে তাঁদের শাস্তি পেতে দেখা যায়নি। রাজীব গান্ধী অব্যাহতি পেয়েছেন বোফর্স কেলেঙ্কারির মামলা থেকে। পি ভি নরসিম্‌হা রাও খালাস পেয়ে গিয়েছেন সেন্ট কিট্‌স মামলায় কিংবা হারিন পাঠক ঘুষ কেলেঙ্কারির হাত থেকে। এল কে আদবানিকেও বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলা থেকে বেকসুর রেহাই দেওয়া হয়েছে। কারণ নাকি ''প্রমাণ নেই''। এরা কেউই প্রমাণ রেখে চুরি করেননি। কেউই তা করে না। সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার ক্ষেত্রে। 'সাউদার্ন পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন' সংক্রান্ত এক মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট জয়ললিতাকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেয়। এই রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি ভেঙ্কটচলম্ মন্তব্য করেছিলেন যে, কেউই বিচারব্যবস্থার ঊর্ধ্বে নয়; যে যত বড় ক্ষমতাধরই হোক না কেন, আইনের সামনে তাকে নতজানু হতেই হবে। কিছুদিন পরে বিচারপতি রাজামানিকম্ এক বিশেষ আদালতে জয়ললিতাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে রায় দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে, এই গণতন্ত্রে ক্ষমতাশালী এবং অর্থবান মানুষরা সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণ হয়ে যায় যে, অভিযোগের সত্যতা বিচারের দ্বারা নয়, আজকের দিনে বিচারের রায় নির্ধারিত হয় অর্থ এবং ক্ষমতার দ্বারা। অধঃপতন এতদূর হয়েছে যে, কোন কারণে যদি বিত্তশালী কারো কারাদণ্ড হয়েও যায় তবুও সে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, তার হয়ে মাইনে করা গরিব মানুষ জেলে প্রক্সি দেয়। বিচারব্যবস্থা দেখেও দেখে না।

সঠিক তথ্য-প্রমাণ সরবরাহ করে বিচারব্যবস্থাকে সঠিক পথে চালাবার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং প্রশাসনের যে গুরুদায়িত্ব আছে, সেক্ষেত্রেও প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর গাফিলতির ঘটনা ঘটে। শাসকদলের প্রশ্রয়পুষ্ট খুনি আসামী মাথায় ওয়ারেন্ট নিয়ে থানায় বসে মুর্গি খায়, ফিস্ট করে। পুলিশ রিপোর্ট দেয় আসামী ফেরার, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি বারুইপুরে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধকে কিছু দুষ্কৃতী বাড়ি ছাড়া করে রাখলে কলকাতা হাইকোর্টে তিনি একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলার রায় দিতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বারীন ঘোষ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে কটাক্ষ করে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন বলবৎ আছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিচারপতি ঘোষ জানান, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে তাঁর কাছে প্রতিদিনই অসংখ্য অভিযোগ জমা হচ্ছে। পুলিশ কখনও অভিযোগকারীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তদন্তে নামছে, আবার কখনও অভিযুক্তের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অভিযোগকারীকেই লক-আপে ভরে দিচ্ছে। কোথাও বা দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে মানুষ দোকান চালাতে পারছে না; এমনকী এদের অত্যাচারে ঘর বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮-২-০৪)। পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার।

পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতি কিংবা নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে আদালতগুলির পক্ষে বিশেষ কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। দেশ স্বাধীন হলেও বিচারব্যবস্থার কোনও গণতন্ত্রীকরণ হয়নি। আদালতগুলি ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চলে। তার ওপর স্বাধীনতার পর গত পঞ্চাশ বছরে

তিনের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েতে কর চাপানোর বিরুদ্ধে নামখানায় বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানায় পঞ্চায়েতে কর চাপানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

এই ব্লকের মৌসুমী পঞ্চায়েতে কর চাপানোর নোটিশ জারি করলে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এস ইউ সি আই-এর স্থানীয় শাখার পক্ষ থেকে জনসাধারণের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদী স্মারকলিপি মৌসুমী পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে গত ২৯ মার্চ পেশ করা হয়।

ঐ একই বিষয়ে শতাধিক মানুষের এক মিছিল ২ এপ্রিল নামখানা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিডিও'র অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তিনি দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং পরবর্তী মিটিং-এ এই দাবিপত্র উত্থাপন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পরিচারিকাদের জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

নিজেদের পেশাগত দাবিদাওয়া নয়, বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে এগিয়ে এলেন পরিচারিকারা। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির মথুরাপুর থানা কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সহযোগিতায় গত ২৬ মার্চ মথুরাপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার বেহাল অবস্থার বিরুদ্ধে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রায় দেড় শতাধিক পরিচারিকা মথুরাপুর স্টেশন থেকে মিছিল করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটে বিক্ষোভ সভায় সমবেত হন। পরিচারিকাদের আত্মীয়স্বজন প্রায় পঞ্চাশজন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় মানুষ মিলে প্রায় চার শতাধিক মানুষ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধ, কুকুরে ও সাপে কামড়ানোর প্রতিষেধক, উপযুক্ত ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ করে বন্ধ অপারেশন থিয়েটার চালু করা, ডায়েরিয়া রোগী ও প্রসূতি মায়েদের উপযুক্ত চিকিৎসা, ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম চুরি বন্ধ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থার দাবি নিয়ে স্থানীয় সমাজসেবী পৃথ্বীশ কর, পরিচারিকা সমিতির মথুরাপুর থানা কমিটির সম্পাদিকা অম্বিকা বিশ্বাস এবং মথুরাপুর থানা জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সম্পাদক কালিদাস কপাটের নেতৃত্বে আট জনের প্রতিনিধি দল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এক স্মারকলিপি দেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধিদের আলোচনা চলাকালীন বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষিকা মীরা কর। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার সুযোগের অভাব, সরকারি অবহেলা ও দুর্নীতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সম্পাদিকা পুষ্প পাল, স্থানীয় শিক্ষক লক্ষ্মণ মণ্ডল এবং জেলা জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সম্পাদক ডাঃ হান্নান হালদার। ডেপুটেশন শেষে পরিচারিকা সমিতির শুভানুধ্যায়ী প্রাক্তন শিক্ষিকা অরুণা কর প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানান যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সেগুলি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজস্থানে সর্বভারতীয় কর্মশালায়

বিদ্যুৎ সংস্কার প্রসঙ্গে অ্যাবেকা'র বক্তব্য

সি ইউ টি এস নামক একটি গ্রাহক সংগঠনের উদ্যোগে গত ১৮ ও ১৯ মার্চ ২০০৪ রাজস্থানের জয়পুরে একটি সর্বভারতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার বিষয় ছিল — ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ সংস্কার। এই কর্মশালায় রাজস্থান, উত্তরাঞ্চল, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, চেন্নাই, অন্ধ্র, কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেবল অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদককেই আহ্বান করা হয়েছিল। উপরোক্ত কর্মশালায় তিনি সংগঠনের পক্ষ থেকে যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন, তা নিচে দেওয়া হল।

মাননীয় চেয়ারপার্সন ও বন্ধুগণ,

বিদ্যুতের মতো একটি আবশ্যিক বিষয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালায় আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সংগঠন 'অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনে'র পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি সর্বপ্রথম যে কথাটি বলতে চাই তা হ'ল, সংস্কার কার্যক্রম সবসময়ই যে জনস্বার্থে তৈরি হয় এবং সব সংস্কারই যে জনগণের উন্নয়ন ঘটায়, একথা সত্য নয়। বহু ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সংস্কার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। সংস্কার জনস্বার্থের পরিপূরক হবে নাকি বিরুদ্ধে যাবে, তা নির্ভর করে সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগের উপর। সেই কারণেই সংস্কারের নামে আত্মহারা না হয়ে সংস্কারের প্রতিটি কর্মসূচি এবং বক্তব্যকে জনসাধারণের উন্নয়নের মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হবে।

আমাদের সংগঠন চায় সময় নষ্ট না করে খুব দ্রুত উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ শিল্পে সংস্কার করা হোক।

আমরা মনে করি, বিদ্যুৎ আজ আর শুধু প্রয়োজনীয় পরিষেবা নয়। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্ত স্তরের উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যে এবং অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবায় পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের অগ্রগতি ও আর্থিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে বিদ্যুৎ। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর আজ উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আমরা লক্ষ করলেই দেখতে পাবো যে, দেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ যাদের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী বলা হচ্ছে — যারা যে কোন উন্নত দেশের তুলনায় ২০০/৩০০ বছর পিছিয়ে রয়েছেন, তাঁরা উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ২ থেকে ৫ শতাংশ ব্যবহার করে থাকেন।

আমাদের দেশের আরও ২৫ শতাংশ মানুষ, যারা নিজেদের মধ্যবিত্ত বলতে ভালবাসেন, কিন্তু বাস্তবে যাদের সুস্থ জীবনযাপনের মতো বাসস্থান নেই, দূষণমুক্ত পানীয় জল নেই, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই, প্রকৃতপক্ষে এরাও গরিব মানুষ। জনগণের এই অংশ মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া আর ১৫ শতাংশ মানুষ যারা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত, তাঁরা হচ্ছেন ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক, বড় ব্যবসায়ী, অথবা গ্রামের ধনীচাষী বা করপোরেট হাউসের বড় কর্মচারী। এই মধ্যবিত্ত অংশ উৎপাদিত বিদ্যুতের ৩০ শতাংশ ভোগ করেন। ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় নানা সরকারি কাজে। বাকি যে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ, তা ভোগ করেন এদেশের জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ। এরা দেশের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়।

বিদ্যুৎ শিল্পের সংস্কারের লক্ষ্য যদি হয় জনস্বার্থ পূরণ করা, তবে উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করলে আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবো যে, দেশের পিছিয়ে-থাকা ৭৫ শতাংশ মানুষের স্বার্থে, এর মধ্যে আবার বিশেষত দারিদ্র্যসীমার নিচের ৩৫ শতাংশ মানুষের স্বার্থেই বিদ্যুৎ শিল্পের সংস্কার প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, ৮৫ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে মাত্র ৩৯ শতাংশ গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে, ৭৬ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, মাত্র ২১ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারছেন। এ কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে ৮ কোটির বেশি লোকসংখ্যা, সেখানে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা মাত্র ৫৬ লক্ষ। কৃষিতে মাত্র দেড় লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক। বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় মাত্র ২১০০০ মিলিয়ন ইউনিট (২১০০ কোটি) — যা কিনা আমেরিকার জনগণ ৩০০ বছর আগে ব্যবহার করতো। অতএব একথা পরিষ্কার যে, আমাদের রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ আর্থিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

এবার দেখা দরকার আমরা কী ধরনের বা কী মানের বিদ্যুৎ পাচ্ছি। যে সামান্য বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পেয়ে থাকে তার মান অত্যন্ত নিচু। কারণ লোডশেডিং এবং লো-ভোল্টেজ প্রায় রোজকার বিষয়। এর ফলে গ্রামে মাঠের শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শহরে ক্ষুদ্র শিল্পের মাল নষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রকৃতই জনগণের উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ শিল্পে সংস্কার করতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে ঃ

(১) অবিলম্বে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হবে, (২) ২৪ ঘণ্টা সঠিক ভোল্টেজে বিদ্যুৎ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, (৩) পিছিয়ে-থাকা ৮০ শতাংশ জনগণের জন্য, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষির জন্য কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

এবার দেখা যাক, সংস্কারের নামে যে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু করা হয়েছে, তার মৌলিক বিষয়গুলো কী। সংক্ষেপে মূল দিকগুলি হ'ল ঃ (ক) বিদ্যুৎ শিল্পকে তিন ভাগে — যথা (i) উৎপাদন, (ii) সঞ্চালন ও (iii) বন্টন-এ ভাগ করে দেওয়া; (খ) বেসরকারীকরণ; (গ) প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি; (ঘ) ক্যাপটিভ উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া; (ঙ) বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে মাশুল নির্ধারণ করা; (চ) বিদ্যুৎ সরবরাহের খরচের সমান হারে বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ করা; (ছ) পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেওয়া; (জ) সংবিধানে বিদ্যুৎ যুগ্মতালিকা ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎকে মূলত কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া; (ঝ) রাজ্য সরকারের পরিবর্তে রাজ্য সরকার মনোনীত 'রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে'র হাতে ক্ষমতা অর্পণ; (ঞ) সাধারণ গ্রাহকদের সিভিল কোর্টে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিচার চাইবার অধিকার হরণ করা প্রভৃতি।

এখন দেখতে হবে, উপরোক্ত সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যুতের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর সমাধান কতটা সম্ভব হচ্ছে। সরকারের সংস্কার নীতির ফলে বিদ্যুৎ সম্পূর্ণভাবে পণ্যে পরিণত হবে। বিদ্যুতের মাশুল হু হু করে বাড়তে থাকবে। কেবলমাত্র 'ওপেন অ্যাকসেস' বা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেই মাশুল বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এই সংস্কারের ফলে গ্রামীণ মানুষ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। কোন সংস্থাই গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে চাইবে না। কারণ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হলে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে হয় অনেক দাম বাড়াতে হবে, না হয় অনেক লোকসান দিতে হবে। বেসরকারি কোম্পানি কোন্‌টা করবে? এর ফলে যে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর বেকার সমস্যা সমাধান অনেকটা নির্ভর করছে সেই কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রামীণ শিল্প তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। এর ফলে গ্রামের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলার বদলে অন্ধকার নেমে আসবে। তাহলে বর্তমান সংস্কারের দ্বারা কারা লাভবান হচ্ছে?

লাভবান হচ্ছে — প্রথমত, বিদ্যুৎ শিল্পে বিনিয়োগকারী বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী; দ্বিতীয়ত, যেসব বৃহৎ শিল্প ক্যাপটিভ উৎপাদন করতে পারবে তারা ; তৃতীয়ত, অভিন্ন মাশুলের কারণে বৃহৎশিল্প ও বড় গ্রাহকদের মাশুল কমে গেলে তারা উপকৃত হবে।

বিশ্বে সর্বপ্রথম চিলি, তারপর ইংল্যান্ডের থ্যাচার সরকার এই সংস্কার চালু করেছিল। আমাদের দেশে এ জিনিস ওড়িশায় প্রথম চালু করা হয়েছে, যাকে 'ওড়িশা মডেল' বলা হচ্ছে। কিন্তু এ সবের ফল কী দাঁড়িয়েছে? কোথাও মাশুল কমেছে কি? ওড়িশায় ৯০০ কোটি টাকা লোকসান দেখিয়ে আবার মাশুল বাড়ানো হয়েছে। যেসব রাজ্যে এই সংস্কার এখন পর্যন্ত চালু হয়েছে সেখানেই এক ধাক্কায় মাশুল বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলোর কাজ দাঁড়িয়েছে প্রতি বছর বিদ্যুতের মাশুল বাড়িয়ে যাওয়া। পশ্চিমবঙ্গে গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদ্যুতিকরণের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলা যায়। ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি গ্রাহকেরা ২৫ পয়সা ইউনিট হিসাবে বিদ্যুৎ পেত, এখন পাচ্ছে ১৩৮ পয়সা ইউনিট, ২০০৪-০৫ সালের জন্য ১০০% বৃদ্ধি চাওয়া হয়েছে। অপরদিকে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর মাশুল আনুপাতিক হারে অনেকটা কমেছে।

এই সংস্কার বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের নামে কোম্পানির হাতে এক স্বৈরাচারী ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। কোন প্রমাণ না দিয়েই লাইন কেটে দিয়ে কোটি কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু তাতে বণ্টন ও সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ কমছে না।

এসব থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, বিশ্বায়নের পরিপূরক হিসাবে বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর স্বার্থে বর্তমান সংস্কার করা হচ্ছে। এর সাথে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জনগণের স্বার্থে যদি বিদ্যুৎ নীতির সংস্কার করতে হয় তাহলে (ক) বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে; (খ) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে বিদ্যুতে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়াতে হবে; (গ) আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে নিতে হবে; (ঘ) অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তিতে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র বাণিজ্য এবং গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে কম দামে বিদ্যুৎ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে; (ঙ) লাইসেন্সি সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি ভঙ্গ করলে আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কথা বলেই আমি আপনাদের আরো একবার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি।

গণতন্ত্র এক মরীচিকা

দুয়ের পাতার পর

ধীরে ধীরে খোদ বিচারব্যবস্থাটিই দুর্নীতির একটি আখড়ায় পরিণত হয়েছে। 'আইনের চোখে সকলেই সমান' — কথাটি আজ শুধুই 'কথার কথা'। বিপুল পরিমাণ অর্থ ছাড়া আদালতে এখন মামলা দায়ের করা যায় না, ফলে অত্যাচারিত দরিদ্র মানুষের পক্ষে সুবিচার পাবার আশা আজ স্বপ্ন বিশেষ। টাকা এবং প্রভাব খাটিয়ে আদালতগুলি থেকে যেমন খুশি রায় বের করে আনা যায়। নির্দিষ্ট বিচারপতির সঙ্গে নির্দিষ্ট আইনজীবীর 'বিশেষ সুসম্পর্কে'র বিষয়টি নিয়ে আজকের দিনে কোর্ট চত্বরে খোলাখুলি আলোচনা শুনতে পাওয়া যায়। 'কমনওয়েল্থ হিউম্যান রাইট্‌স ইনিশিয়েটিভ'-এর ডিরেক্টর এম দারুওয়ালা মন্তব্য করেছেন যে, গোটা বিচারব্যবস্থাটি আজ তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। হাতে অর্থ থাকলে এবং দুর্নীতির রাস্তাটি ঠিক কোন্‌দিকে বাঁক নিয়েছে সে কথা জানা থাকলে যে কেউ আজ হাইকোর্ট, এমনকী সুপ্রিম কোর্ট থেকেও লিখিত রায়ের কপি বার করে আনতে পারে। আদালতগুলির চত্বরে চত্বরে আজ টাউট, আইনজীবী ও বিচারপতিদের দুষ্টচক্র একটি সমান্তরাল বিচারব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জি বি পট্টনায়ক মন্তব্য করেছেন, নিম্ন আদালতগুলির বিচারপতিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা উচ্চ আদালতের হাতে থাকলেও হাইকোর্টের বিচারপতিরা এ নিয়ে মাথা ঘামান না (টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া, ১৪-৩-০৪)। অসংখ্য মামলা অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। হাইকোর্টগুলিতে এ ধরনের মামলার সংখ্যা ৩৪ লক্ষ, সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত ২০ হাজার কেস এখনও বিচারের অপেক্ষায়। কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। এমনকী কখনও কখনও কোর্টগুলিতে কাগজ-কলম পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে বিচারপতি খারে বলেছেন, এই মুহূর্তে বিচারব্যবস্থা সংস্কার না করা হলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

ফলে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আস্তানা গেড়ে বসা দুর্নীতি, বেআইনি কাজকর্ম, স্বজনপোষণ কিংবা ক্ষমতা অপব্যবহারের ঘটনায় জর্জরিত হয়ে বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়ে আজ সুবিচার প্রায়শই মেলে না। প্রকৃতপক্ষে শুধু বিচারব্যবস্থা নয়, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের সারা শরীরেই আজ পচন ধরে গিয়েছে। বাইরের ধড়াচূড়াটুকু বজায় থাকলেও এই গণতন্ত্রেরই অঙ্গ হিসাবে বিচারব্যবস্থাটি হয়ে পড়েছে অন্তঃসারশূন্য ও ক্লেদাক্ত। তাই সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা যাচ্ছে একই চিত্র। এই অবস্থায় বিচারপতি পরিবর্তন করে, বা অন্যরকম জোড়াতালি দিয়ে এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। মরতে বসা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে সমূলে উচ্ছেদ করে নতুন উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারাই কেবলমাত্র এ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সরকারি খাজনা নীতি — কৃষকের সর্বনাশের নয়া নক্সা

খাজনা নিয়ে এখন গ্রাম-বাংলা জ্বলছে। একদিকে খাজনা সংক্রান্ত সরকারি চণ্ডনীতি, তার উপর চলছে আইনি-বেআইনি নানাপথে খাজনা আদায়ের জুলুম। রাজ্যজুড়ে এই বেআইনি কাজ ও সরকারি চণ্ডনীতি প্রতিরোধে পাল্টা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে চাষী-মজুরের একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই ও তার কৃষক সংগঠন 'সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন'। বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক আর আই; বি এল অ্যান্ড এল আর ও এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ঘেরাও, আন্দোলন, অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যের বহু জায়গায় বেআইনি খাজনা ও সেস আদায় বন্ধ করা গেছে এবং প্রবল তাগাদা সত্ত্বেও ২৩ বছরের বকেয়া সেস্ আদায় করতে পারেনি সরকার। শেষপর্যন্ত আন্দোলনের চাপে আত্মসমর্পণ করে বকেয়া সেস্ মকুব ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। দীর্ঘদিন বাদে রাজ্যজুড়ে কৃষক আন্দোলনের এটা একটা বিরাট জয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও রাজ্যজুড়ে খাজনার বিপদ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এর কারণ অনেকগুলি। প্রথম কারণ হল — সরকার ব্যাপকহারে খাজনা বাড়িয়েছে, যা পরিশোধের সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করছে। দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৩৮৫ সালে শহরাঞ্চলে যে খাজনা শতকে ১৮ পয়সা ছিল, ১৪১০ সালে তা বেড়ে প্রতি শতক ১৭৫ টাকা হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে যে খাজনা শতকে ৯ পয়সা ছিল, ১৪১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকে ২০ টাকা। তাহলে কতগুণ বেড়েছে? শহরাঞ্চলে ১০০০ গুণ ও গ্রামাঞ্চলে ২০০ গুণেরও বেশি। শুধু তাই নয়, এর বাইরে ভূমি সংস্কার দপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা চক্র সর্বশেষ 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৩'-কে অপব্যাখ্যা করে খাজনা ও সেস্ বিশ/পঁচিশ গুণ পর্যন্ত আদায় করছে। রাজ্যের জমির মালিকেরা খাজনা নীতি তথা ভূমি সংস্কার আইন সম্পর্কে অসচেতন ও উদাসীন থাকায় খাজনা আদায় দপ্তর এই বেআইনি কাজ বহাল তবিয়তে চালাতে পারছে।

বর্তমানে খাজনা আদায়ে জমিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (১) কৃষিজমি, (২) বাস্তু/অকৃষি জমি ও (৩) বাণিজ্যিক জমি। এখন প্রশ্ন হল, কোন্‌টা কোন্ জমি তা চিহ্নিত করা হবে কী করে? তার উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

(১) কৃষিজমি ঃ যে জমি চাষের জন্য ব্যবহার করা হবে বলে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখিত, সে জমিকে কৃষি জমি বলে — যেমন, ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি — ধানের জমি, আমচাষের জন্য ব্যবহৃত জমি —আমবাগান, কাঁঠাল চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি — কাঁঠাল বাগান, বাঁশচাষের জন্য ব্যবহৃত জমি — বাঁশবাগান, মাছচাষের জন্য ব্যবহৃত জমি — পুকুর ইত্যাদি। এ সবই কৃষি জমি।

(২) অকৃষি জমি ঃ যে জমি ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখিত নয়, এমন জমিকে অকৃষি জমি বলে। যেমন ডাঙা জমি, বাগানের জমি ইত্যাদি।

(৩) বাণিজ্যিক জমি ঃ কল-কারখানা-কর্মশালা বা দোকান ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমিকে বাণিজ্যিক জমি বলে। এই অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য কথাটির অর্থ হল — অন্যান্য সমজাতীয় বাণিজ্যিক চরিত্রসম্পন্ন জমি। কিন্তু খাজনা আদায় দপ্তর এই কথাটি তাদের মর্জি মাফিক ব্যাখ্যা দিয়ে কৃষি ও অকৃষি জমিকেও বাণিজ্যিক জমি হিসাবে দেখাচ্ছে। যেমন - পুকুর, বাঁশঝাড়, পান বরজ ইত্যাদি জমিকে বাণিজ্যিক জমি হিসাবে দেখিয়ে, আইনের অপব্যাখ্যা করে, বহুগুণ বেশি খাজনা ও সেস্ আদায় করছে।

এছাড়া আর যেসব ক্ষেত্রে বেআইনিভাবে খাজনা আদায় চলছে, সেগুলি হল —

(ক) মকুবভুক্ত রায়তকে মকুবের স্বীকৃতি না দেওয়া। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, পূর্বে কোন পরিবার সেচ ও অসেচ এলাকায় যথাক্রমে ৪ একর ও ৬ একরের বেশি জমির মালিক থাকায় মকুবভুক্ত রায়ত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবারটির পুত্র/কন্যা সাবালক হওয়ায় ঐ পরিবার ভেঙে আলাদা আলাদা পরিবার তৈরি হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে নতুন পরিবারটির সম্পত্তি যথাক্রমে ৪ বা ৬ একরের নীচে থাকা সত্ত্বেও তাদের মকুবভুক্ত রায়ত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না, যেহেতু মূল পরিবারটি পূর্বে মকুবভুক্ত রায়ত ছিল না। এইভাবে বর্তমানে মকুবভুক্ত রায়তদের কাছ থেকেও বাড়তি খাজনা ও সেস্ আদায় করা হচ্ছে।

(খ) পরিবারভিত্তিক খাজনা না নিয়ে পড়চাভিত্তিক খাজনা আদায়। পরিবারের সদস্যদের নামে নানান মৌজায় জমি থাকায় এক পরিবারের মোট জমির বহু পড়চা থাকে। সমস্ত পড়চাগুলোর জমি একত্রিত করে, পরিবারের মোট জমি নির্ধারণ করে খাজনা আদায়ের বিধি থাকলেও তা করা হচ্ছে না। অর্থাৎ পরিবারভিত্তিক খাজনা না নিয়ে পড়চাভিত্তিক খাজনার দাখিলা কেটে খাজনা বহুগুণ বাড়িয়ে আদায় করা হচ্ছে।

(গ) বেআইনিভাবে সুদ আদায়। খাজনা নীতিতে বকেয়া খাজনা ও সেস্-এর উপর সুদ আদায়ের বিধি না থাকলেও বেআইনিভাবে তা আদায় করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধিত) আইন, ২০০৩-এর ২৩ ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে — 'ইতিমধ্যে যদি কোন রায়ত ধার্য খাজনার চেয়ে বেশি টাকা জমা দিয়ে থাকে, তাহলে এই ধারা মতে সেই অতিরিক্ত টাকা রায়তকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু খাজনা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি রায়তের কোন ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে সেই ঘাটতির অর্থ রায়তের কাছ থেকে বকেয়া খাজনা হিসাবে ১৯১৩ সালের 'বেঙ্গল পাবলিক ডিম্যান্ড রিকভারি অ্যাক্ট' বলে তা আদায় করা হবে। তবে ঐ ধরনের বকেয়ার জন্য কোন সুদ দাবি করা যাবে না।' ['If any amount already paid by a raiyat is in excess of the revenue payable by him under this section the amount paid in excess shall be refunded to him but, if there is any deficiency in such payment, such deficiency shall be recovered from him as an arrear of revenue under the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913 without claim for interest being made on such deficiency' the West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 2000 Section 23] — এই বিধি ভেঙে রাজ্য সরকার ১৩৮৫ সাল থেকে ১৪০৭ পর্যন্ত এক টাকা বকেয়া খাজনা ও সেস্ এর উপর ২২ টাকা সুদ আদায় করছে।

(ঘ) ২নং জমাবন্দী খাতা সংরক্ষণ না করা। রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ৮নং নির্দেশে পরিষ্কার উল্লেখ আছে — রায়ত কোন্ সালে কত খাজনা পরিশোধ করলেন এবং কার কাছে কত বকেয়া আছে তা জানার জন্য রাজস্ব বিভাগকে অবশ্যই ২নং জমাবন্দী খাতা সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু রাজ্যের সর্বত্রই ভূমিরাজস্ব দপ্তর এই খাতা লোপাট করে দিয়ে একই জমির খাজনা একাধিকবার আদায় করছে। এর ফলে খাজনা জমা দিয়েও রায়ত নিশ্চিত হতে পারবে না যে খাজনার বোঝা কমল। কারণ খাজনা দেওয়ার প্রমাণপত্র বা দাখিলা যদি রায়ত কখনও হারিয়ে ফেলে বা বন্যা বা আগুন লাগার মত দুর্ঘটনায় তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে একবার দেওয়া খাজনা ও সেস্ তাকে সুদ সহ পুনরায় দিতে হবে।

খাজনা মকুব ও সরকারি প্রতারণা

রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার ভোট পাওয়ার তীব্র লালসায় 'কৃষকের খাজনা মকুব' — এই ঘোষণা করে বাংলার কৃষক সমাজকে বিরাট প্রতারণা করেছে। এই প্রতারণার বিষময় ফল কৃষক সমাজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আজ ২৬ বছরের মাথায় এক একজন জমির মালিকের মাথায় বিরাট অঙ্কের খাজনার বোঝা চেপেছে। যে কৃষক সমাজকে সার-ডিজেল-বীজ-কীটনাশকের দামবৃদ্ধি অথচ ফসলের ন্যায্যদাম না পাওয়ার খেসারত দিতে হচ্ছে — যার পরিণতিতে ঘরছাড়া-ঋণগ্রস্ত হওয়া, আত্মহত্যা, এমনকী অভাবের তাড়নায় সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করতে তারা বাধ্য হচ্ছে — সেই সর্বস্বান্ত কৃষকের উপর এই বিপুল অঙ্কের খাজনার বোঝা সরকার চাপাচ্ছে। সর্বশেষ জনগণনা সমীক্ষা দেখিয়েছে, এ রাজ্যে ১৯৯১-২০০১ সালের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা ৮ লক্ষ কমেছে এবং ক্ষেতমজুরের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বেড়েছে।

এর পাশাপাশি আমরা দেখছি, হাজার হাজার কোটি টাকা কর ছাড় দিয়ে মালিকদের পুষ্ট করছে সরকার। ক্যাগ রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত বছরে প্রায় ৬ হাজার কোটিরও বেশি টাকা মালিকদের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। যে টাকা আদায় করে সহজে রাজকোষে আয় বাড়াতে পারত সরকার, সে পথে না গিয়ে সেই সরকারই রাজকোষে ঘাটতির অজুহাতে সাধারণ মানুষের উপর নানাখাতে ট্যাক্স ও খাজনার চাপ বাড়াচ্ছে। খাজনার ক্ষেত্রে এই জুলুমের প্রমাণ ক্যাগ রিপোর্টে পাওয়া যায়। ক্যাগ রিপোর্ট দেখিয়েছে —১৯৯৯-২০০০ সালে ১৪৮.৮৮ কোটি, ২০০০-২০০১ সালে ৫১০.৮০ কোটি, ২০০০-২০০২ সালে ৭১১.২২ কোটি, টাকা খাজনা আদায় করেছে রাজ্য সরকার। আর বর্তমান বছরে (০৩-০৪ সালে) রাজ্যের সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিটের কোটা বেঁধে দিয়ে খাজনা আদায় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। সেই অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব দপ্তরকে সাজানো হচ্ছে। লোকাল আদায় ইউনিট আর. আইদের ছুটি বাতিল, ব্যাঙ্ক-সমবায়, বেসরকারি উদ্যোগ, এমনকী এই কাজে পুলিশ নামাবার তোড়জোড় চলছে। ক্যাগ প্রতিবেদন অনুযায়ী, যেখানে শিল্প মালিকদের থেকে সেলস্ ট্যাক্স নামক রাজস্ব খাতে আদায় বৃদ্ধির হার ১১ শতাংশ, সেখানে কৃষকদের থেকে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বর্ধিত হার ৩৯ শতাংশ। এই হচ্ছে তথাকথিত জনদরদী ফ্রন্ট সরকারের কৃষক দরদের সামান্য নমুনা। এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গরিব দরদের নামে ক্ষমতায় টিকে থাকা সি পি এম ফ্রন্ট সরকার আসলে মালিকের সেবা করে চলেছে।

এখন প্রশ্ন হল, সরকার একবার খাজনা মকুব ঘোষণা করে কেন এই নীতির পরিবর্তন করল? কেন হাজার হাজার কোটি টাকা মালিকদের ছাড় দিচ্ছে অথচ গরিব জনসাধারণের উপর ট্যাক্স-খাজনা বিপুল হারে চাপাচ্ছে? কারণ একটাই। এই সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল আয়ত্ত করে পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে যে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে সাধারণ জনগণের সমর্থন আর তেমন দরকার নেই। দরকার মিল মালিক-শিল্পপতি-পুঁজিপতি গোষ্ঠীর আশীর্বাদ, পুলিশ-গুণ্ডা-মাফিয়াদের ব্যাকিং। এটা থাকলেই ক্ষমতায় বারে বারে ফিরে আসা যাবে।

এমতাবস্থায়, চাষী-মজুর সহ সর্বস্তরের মানুষের কর্তব্য সরকারের গরিব ঠকানো রাজনীতির মুখোশ খুলে দেওয়া। জনবিরোধী খাজনা নীতির বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে চাষী-মজুরদের সংগঠিত করে গণকমিটির মাধ্যমে ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করা এবং তৃণমূলস্তর থেকে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া। এই পথেই একমাত্র এই ভয়াবহ খাজনা নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

পুরুলিয়ার কালুহার — যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে

কেন্দ্রের ভারত উদয় এবং রাজ্যের বঙ্গ উদয়ের প্রচারে যখন গল্পের গরু গাছে চড়ছে, তখন বাংলার গ্রামের মানুষ কেমন আছেন? পুরুলিয়ার কালুহার গ্রামের নলিনীরঞ্জন মাহাতো শোনালেন সেই কাহিনী।

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পারা থানার অধীন কালুহার একটি অনগ্রসর গ্রাম। এ গ্রামে কুর্মি, রাজোয়ার, নাপিত, কামার ও হাড়ি — এই কয়টি অনুন্নত জাতের বাস। কোন তথাকথিত উচ্চজাতের বাস এখানে নেই। নেই বলেই, নিন্দুকেরা বলে এ গ্রামটিতে যুগ যুগ ধরে (১২ বছরে যুগ ধরলে বামফ্রন্টের ২৭ বছরের শাসনে দুই যুগ) বিজলি বাতি জ্বলেনি।

এদেশের যত মত তত পথের গণতন্ত্রে বহুবিধ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে ও হচ্ছে। নাম ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য এক, নিরীহ জনগণের উপর মাতব্বরি করে নিজেদের আখের গোছানো।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৫৭ বছর পরেও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র, অসচেতন জনগণ কি বোঝেন জানি না — তবে যুগ যুগ ধরে কালুহার গ্রামে বিদ্যুতের তার আছে তো খুঁটি নেই — আবার খুঁটি আছে তো তার নেই। বিদ্যুতের আলোর স্বপ্ন — জনগণের দুঃস্বপ্নেই থেকে গেল, বাস্তবে পরিণত হল না। কেন হল না — বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিশ্চয় বুঝবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

স্বাধীনতা লাভের পর এ তাবৎ ৫৭ বছরে গণতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে নির্বাচন আসে যায়, অনগ্রসর কালুহার চিরদিন অন্ধকারেই থেকে যায়। কতদিনে আলো জ্বলবে, অন্ধকার দূর হবে — দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ। অথচ নাকের ডগায় সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে কালুহারকে পরিহাস করছে নাকি কটাক্ষপাত করছে — কে জানে!

ইরাকে প্রতিরোধ যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে

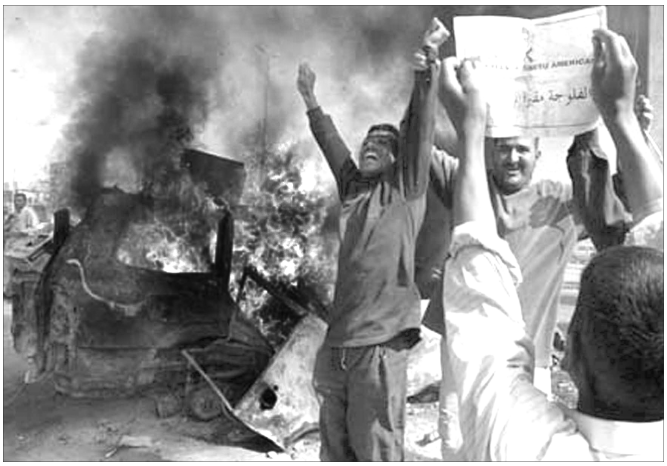

২৬ মার্চ ঃ দক্ষিণ কারবালা শহরে জোট সেনাদের একটি ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা ৫টি হামভি সেনা ট্রাক ও জীপের ক্ষতি করেছে এবং প্রচুর পরিমাণে গুলি-গোলা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছে। ২ জন মার্কিন সেনা গেরিলাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, ২৭-৩-০৪)

ফালুজা শহরে ইরাকি গেরিলা ও মার্কিন মেরিন সেনাদের মধ্যে চার ঘণ্টা ধরে জোর সংঘর্ষ চলে। এখানে ইরাকি গেরিলারা মর্টার ও রকেট- চালিত গ্রেনেড নিয়ে মেরিন সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। 'এ বি সি' টিভির ফটোগ্রাফার সহ ৭ জন ইরাকি নাগরিক এবং ৫ জন মেরিন সেনা নিহত হয়েছে। ৭ জন মেরিন অফিসার আহত হয়েছে।

তিকরিত শহরে অপর এক সংঘর্ষের ঘটনায় তিনজন ব্রিটিশ সেনা ও পাঁচজন ইরাকি পুলিশ মারা গেছে। রাস্তার ধারে পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে মধ্য বাগদাদে এক মার্কিন ঠিকাদারি সংস্থার ৭ জন ইরাকি কর্মচারী আহত হয়েছে। (হিন্দু, ২৭-৩-০৪)

২৭ মার্চ ঃ বাগদাদে রাস্তার ধারে পেতে রাখা গ্রেনেডের বিস্ফোরণে মার্কিন সেনা অফিসারদের ৭ ইরাকি দোভাষী ঘটনাস্থলে প্রাণ হারিয়েছে। (দি স্টেটস্‌ম্যান, ২৮-৩-০৪)

মসুল শহরে একটি সরকারি ভবনের ওপর গেরিলারা মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালালে ৮ ইরাকি পুলিশ ও ২ জন নাগরিক নিহত হয়েছে। (হিন্দু, ২৮-৩-০৪)

২৮ মার্চ ঃ মসুল শহরে চারটি গেরিলা আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। প্রথম ঘটনায় পূর্ব মসুলের এক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত দুই ব্রিটিশ সিকিউরিটি অফিসার নিহত হন। আর একটি ঘটনায়, এই শহরে মার্কিন প্রভাবিত একটি ইরাকি সংবাদ সংস্থার অফিসে গেরিলারা আক্রমণ চালায়। সংবাদ সংস্থার দুই সাংবাদিক নিহত হয়, এবং অফিসটির প্রভূত ক্ষতি হয়। গেরিলারা একটি মার্কিন সাঁজোয়া গাড়ির উপর দুটি রকেট ছুঁড়েছে। অপর একটি ঘটনায় একটি মার্কিন সেনা কনভয় লক্ষ্য করে গেরিলারা গ্রেনেড ছুঁড়লে দুজন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে। (হিন্দু, ২৯-৩-০৪)

২৯ মার্চ ঃ মসুল শহরে মন্ত্রীর কনভয়ের ওপর গেরিলারা আক্রমণ চালিয়েছে। দুজন কানাডীয় ও একজন ব্রিটিশ সেনা নিহত হয়েছে। আহতের সংখ্যা একাধিক।

বসরা শহরে গেরিলা ও জোট সেনাদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে। একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার সহ তিনজন পোলিশ সেনা নিহত হয়েছে। (হিন্দুস্থান টাইমস, ৩০-৩-০৪)

৩১ মার্চ ঃ বাগদাদের পশ্চিমে আল-আনবার প্রদেশে রাস্তার ধারে পেতে রাখা একটি বিস্ফোরকের সঙ্গে একটি মার্কিন সেনা যানের সংঘর্ষে পাঁচজন মার্কিন সেনা ঘটনাস্থলে মারা গেছে। এদিন সন্ধ্যার দিকে সশস্ত্র গেরিলারা একটি মার্কিন সেনা হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামিয়ে আনলে হেলিকপ্টারের আরোহী ৯ সেনাকর্মী মারা যায়। গত জানুয়ারি মাস থেকে এ নিয়ে তৃতীয় হেলিকপ্টার গেরিলারা গুলি করে নামিয়ে আনল। বাকুবা শহরে একটি আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে স্থানীয় গভর্নরের পাঁচ ইরাকি দেহরক্ষী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

ফালুজা শহরে আমরা মার্কিন সেনাদের কবরস্থান বানাবো — ইরাকি যুবকবৃন্দ

ফালুজা শহরে গেরিলারা দুটি গাড়ির উপর আক্রমণ চালালে ছয় আরোহীই মারা যায়। এদের মধ্যে তিনজনই হচ্ছে মার্কিন ঠিকাদার। রয়টার্স টিভি-র ছবিতে দেখা যায়, স্থানীয় যুবকরা মার্কিন বিরোধী ধ্বনি তুলে গাড়ি দুটিতে আগুন দিচ্ছে, আর বাকিরা আনন্দে হাততালি দিচ্ছে ও উচ্চৈস্বরে বলে চলেছে ''ফালুজা শহরে আমরা মার্কিন সেনাদের কবরস্থান বানাবো।'' (হিন্দুস্থান টাইমস্‌ ১-৪-০৪)

১ এপ্রিল ঃ মার্কিন ঠিকাদারদের নিহত হবার ঘটনার অব্যবহিত পরে ইরাকি পুলিশ ফালুজা শহরে ঢোকার বা বের হবার সমস্ত রাস্তাই সিল করে দিয়েছে এবং শহরের প্রবেশ পথের চেকপোস্টটিতে নজরদারদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও মার্কিন সেনাদের অনুপস্থিতি চোখে পড়েছে। কারণ কালকের ঘটনার পর মার্কিন সেনারা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে এবং তারা প্রহরীবেষ্টিত সেনাঘাঁটির বাইরে পা রাখতে খুব একটা ইচ্ছুক নয়। (দি স্টেটস্‌ম্যান, ২-৪-০৪)

২ এপ্রিল ঃ উত্তর ইরাকের বাকোবা শহরের পশ্চিম অঞ্চলে টহলরত দুটি পুলিশ জীপের উপর গেরিলারা গুলি ও গ্রেনেড চালিয়ে তিনজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছে। (দি স্টেটস্‌ম্যান, ৩-৪-০৪)

৩ এপ্রিল ঃ মাহমুদিয়া অঞ্চলে মার্কিন ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও মার্কিন দালাল পুলিশ বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেছে গেরিলারা। কুফাতেও এক পুলিশ আধিকারিক নিহত হয়েছে গেরিলাদের গুলিতে। (টেলিগ্রাফ, ৪-৪-০৪)

বাকোবা শহরে এক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন মার্কিন সেনা নিহত ও ২টি সেনাট্রাক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৪-৪-০৪)

৪ এপ্রিল ঃ উত্তর ইরাকের ফালুজা শহরে গেরিলাদের সঙ্গে রাতভোর সংঘর্ষে ৪ মার্কিন মেরিন সেনা নিহত হয়েছে।

তৈলনগরী কিরকুকে এক আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সেনা জীপ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেনা জীপের ৪ আরোহীর মধ্যে একজন নিহত ও অপর তিনজন আহত হয়েছে।

এই শহরে অপর একটি ঘটনায় রাস্তার ধারে পেতে রাখা একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণে ৭ ইরাকি পুলিশ মারা গেছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৫-৪-০৪)

৫ এপ্রিল ঃ বাগদাদের পশ্চিমে আল-আনবার প্রদেশে গেরিলাদের আক্রমণে ৪ জন মার্কিন মেরিন সেনা নিহত হয়েছে। (হিন্দু, ৬-৪-০৪)

উত্তর বাগদাদের খাজিমিয়াতে মার্কিন প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশানের তিন সেনা গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে। (দি স্টেটসম্যান, ৬-৪-০৪)

৬ এপ্রিল ঃ ফালুজাতে আজও মার্কিন মেরিনদের সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষ অব্যাহত। এ সংঘর্ষে বহু মার্কিন সেনা হতাহত হয়েছে বলে স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার জানিয়েছেন। (হিন্দু, ৭-৪-০৪)

মোসুল শহরে গেরিলাদের আক্রমণে ৫ জন ইরাকি মিলিশিয়া ও ২ জন ইউক্রেনীয় সেনা মারা গেছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৭-৪-০৪)

৭ এপ্রিল ঃ মধ্য ইরাকের রামাদি শহরের রাজভবনের উপর গেরিলাদের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে ১২ জন মার্কিন মেরিন সেনা নিহত হয়েছে। মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। গেরিলারা এ শহরে গুলি করে একটি মার্কিন হেলিকপ্টার নামিয়ে এনেছে। (হিন্দু, ৮-৪-০৪)

বাগদাদের ১১০ কিমি পশ্চিমে রামাদি শহরে গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১২ জন মার্কিন মেরিন সেনা প্রাণ হারিয়েছে। সব মিলিয়ে এ সপ্তাহেই সরকারি হিসাবে ৩৬ জন মার্কিন সেনা প্রাণ হারিয়েছে। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা ৫০ জন। এদিকে, ফালুজা ও রামাদি শহরে গেরিলাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়ে মার্কিন সেনারা ক্রমশ পিছু হঠছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৮-৪-০৪)

৮ এপ্রিল ঃ উত্তর ইরাকের কিরকুক শহরে গেরিলারা একটি মার্কিন সেনা কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে একজন অফিসার সহ তিন মার্কিন সেনাকে পণবন্দী করেছে। গেরিলাদের আক্রমণে সেনা কনভয়ে থাকা তিনটি তেলের ট্যাঙ্কার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৬ জন মার্কিন সেনার মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বাকোবার কাছে ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণে জোট সেনাদের একটি কনভয়ে থাকা দুটি তেলের ট্যাঙ্কার, চারটি সাঁজোয়া গাড়ি এবং দুটি ট্যাঙ্ক-এ আগুন ধরে যায়। দশজন পোলিশ, তিনজন রুমানীয় ও একজন ইউক্রেনীয় সেনা মারা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ঐ সেনা কনভয়টি উক্ত সময়ে ঐ পথ ধরে যাবে এ তথ্যটি গেরিলাদের আগে থেকে জানা ছিল। তাই তারা বিস্ফোরক ভর্তি গাধায় টানা গাড়িটিকে ঐ পথের ধারের কালভার্টের নীচে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। (ডেকান হেরাল্ড, ৯-৪-০৪)

৯ এপ্রিল ঃ অবরুদ্ধ ফালুজা শহরে যুদ্ধরত মার্কিন সেনারা শ্বেত পতাকা উড়িয়ে ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছে। মার্কিন সেনাদের ইরাক দখলের বর্ষ পূর্তির দিনে ইরাকি গেরিলাদের এই বিরাট সাফল্য প্রতিরোধ লড়াইকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। (বি বি সি ওয়ার্লড নিউজ বুলেটিন, ৯-৪-০৪)

এদিকে ইরাকে মার্কিন প্রশাসক পল ব্রেমার একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছেন বলে জানা গেছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০-৪-০৪)

সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ চূর্ণ

একের পাতার পর

পেয়ে। সত্যিকারের শত্রুকে যদি চিনতে ও চেনাতে ভুল না হয়, আপসহীন মানসিকতায় তার বিরুদ্ধে যদি জনগণকে লড়াইয়ের ময়দানে জড় করা যায় তবে মানুষ ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে এক হতে পারে সর্বজনীন শত্রুর বিরুদ্ধে, যে ঐক্যকে কোন চক্রান্ত করেই ভাঙবার শক্তি কারোর নেই। এটা যে কত বড় শিক্ষা, আমাদের ভারতবাসীর কাছে তা বোঝার সময় এসেছে।

অন্য কোন কিছু নয়, ইরাকি জনগণের মরণপণ মৃত্যুঞ্জয়ী লড়াই-ই খোদ আমেরিকার বুকে ঢেউ তুলেছে। আমেরিকার জনগণের প্রতিবাদ ইতিপূর্বেই দফায় দফায় আছড়ে পড়েছে নিউইয়র্কে, লস এঞ্জেলেসে, ওয়াশিংটনে ও আরও শত শত নগরে-শহরে। এখন কাঁপন লেগেছে হোয়াইট হাউসে, মার্কিন প্রশাসনে, যুদ্ধবাজদের হেড কোয়ার্টারে। ভুল স্বীকারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। নানা কমিশন ও তদন্ত বসছে ভুলটা কার হয়েছিল, তা নিরূপণ করার জন্য। ভাবখানা যেন মার্কিন প্রশাসন হচ্ছে সত্যের পূজারী, ন্যায়ের ধ্বজাধারী। এসবই ইরাকিদের পাল্টা মারে দিশাহারা মার্কিন যুদ্ধবাজদের নিকৃষ্ট ভণ্ডামি। যে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা আজ কমিশন বসিয়ে বিচারের ভাঁড়ামো করছে, তারা সবাই সেদিন সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে হাত তুলে স্বাধীন দেশ ইরাকের উপর হামলাকে সমর্থন করেছিল, নির্বাচনে জর্জ বুশের প্রতিদ্বন্দ্বী জন কেরিও সেই দলেই ছিল। এখন ধরা পড়ে যাওয়ায় অন্য কাউকে বলির পাঁঠা করে মার্কিন জনমতকে বোকা বানাবার ফন্দি করছে।

ইরাককে কেন্দ্র করে আবার উঠে আসছে ভিয়েতনামের নাম। পরমাণু শক্তিধর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ভিয়েতনাম ছাড়তে বাধ্য করে ভিয়েতনামের জনগণ যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তাকে কেউ মুছে দিতে পারেনি, পারবেনা। ইরাকের জনগণও তেমনি আবার প্রমাণ করবে, মূল শত্রুকে চিনে নিয়ে যদি সংগঠিত ভাবে রুখে দাঁড়ানো যায়, তবে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তিধর নেই যারা সেই জনগণকে পদানত করতে পারে।

আর লুকোছাপা করছেন না সি পি এম নেতারা

মালিকশ্রেণীকে সন্তুষ্ট করেই যখন রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে, কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগীদার হতে হলেও যখন তাদের আশীর্বাদ ছাড়া হবে না, তখন আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কীসের! না, কোন লুকোছাপা আর করছেন না সি পি এম নেতারা। লোকসভা নির্বাচনে, বিশেষত দমদম লোকসভা কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য বিপুল সংখ্যক রাজস্থানী মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের আশীর্বাদ তথা সমর্থন পেতে তাদের নিয়ে সল্টলেকের প্রমোদকানন নলবন বোটিং রিসর্টে এক নৈশ মহাভোজে মিলিত হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ পার্টির বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা। অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য বোম্বে থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছিল এক দল গাইয়ে বাজিয়েদের। ব্যবস্থা ছিল হ্রদে বোটিং-এরও। সাথে আড়াই হাজার অতিথির জন্য খাওয়া দাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা।

ভোজসভায় 'বাম' নেতাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জন্য উদ্যোক্তারা পরেছিলেন আপাদমস্তক লাল চুড়িদার পাঞ্জাবি। স্বেচ্ছাসেবকদের পরনে ছিল লাল জামা, লাল টি-শার্ট। অসংখ্য লাল মালা আর পুষ্পস্তবকের সাথে লাল গোলাপে তৈরি কাস্তে-হাতুড়ি-তারাও তাঁরা জ্যোতিবাবুর হাতে তুলে দিয়েছেন। কোন কোন সংবাদপত্রে রস করে লেখা হয়েছে, শাসকদলের নেতৃত্বের পোশাকে নাকি লালের চিহ্নমাত্র ছিল না। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন লাল দেখলে উদ্যোক্তা শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা ভয় পেতে পারেন। আবার গদীনশিন বাম নেতাদের তুষ্ট করতে উদ্যোক্তারা পরেছিলেন লাল জামা। এ এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

এতদিন পর্যন্ত বিজেপি, কংগ্রেস সহ অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলিই এই ধরনের ভোজসভায় শিল্পপতি ব্যবসায়ী তথা মালিকদের সাথে মিলিত হতেন। বামপন্থীরা চিরকাল এগুলিকে সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখতেন, ভোটে সমর্থন আদায় ও টাকা তোলার বাঁকা পথ বলেই মনে করতেন এবং এজন্য শাসক বুর্জোয়া দলগুলির নিন্দা করতেন। বাস্তবে এটি ছিল সংসদীয় রাজনীতির বুর্জোয়া কালচার। এবার সি পি এম কোনও রাখঢাক না রেখে খোলাখুলিই সেই স্রোতে গা ভাসাল। মুখোসের আড়ালে নয় মুখোমুখি নামল।

সি পি এম নেতারা জানিয়েছেন, রাজস্থানী সমাজের সাথে তাঁদের দূরত্ব কমানোর জন্যই নাকি রিসর্টে এই নৈশভোজের ব্যবস্থা। স্থানীয় জনসাধারণ বলছেন, লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি'র তথাকথিত ভোটব্যাঙ্কে যথাসম্ভব ভাগ বসানোই নাকি ছিল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। তা লোকে যে কথাই বলুক, তবুও তো সেটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি। তাহলে তা এই আমোদ-প্রমোদের পরিবেশের মধ্যে সংগঠিত হবে কেন? কেন তাঁদের নিয়ে সাধারণ সভাগৃহে নয়? দ্বিতীয়ত, রাজস্থানের যে সমস্ত সাধারণ, দরিদ্র মানুষ মহানগরীর পথে হকারি করে, ট্যাক্সি চালিয়ে, ঠেলা চালিয়ে, মজুর-শ্রমিকের কাজ করে জীবনধারণ করেন তাঁরা এই ঘনিষ্ঠ হওয়ার কর্মসূচিতে ডাক পাননি কেন? আসলে তাঁরা দূরত্ব কমাতে চেয়েছেন শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের সাথে — সামগ্রিকভাবে রাজস্থানী মানুষের সাথে নয়। অপরদিকে আজ যখন পুঁজিপতিদের চক্রান্তে ভাষা, প্রদেশ প্রভৃতিকে ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের ঐক্য দেশের সর্বত্রই বিঘ্নিত হচ্ছে, সেখানে ভোটের স্বার্থে সম্প্রদায় বেছে বেছে আলাদা করে রাজনৈতিক কর্মসূচি কোন্ নীতির মধ্যে পড়ে?

সি পি এমের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এসেছে সভায় জ্যোতিবাবুর বক্তব্যে। যেহেতু এটা একান্তভাবেই ব্যবসায়ী মালিকদের সমাবেশ ছিল সেখানে তিনি স্বভাবতই তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'বণিকসভাকে আমরা গুরুত্ব দিই। বাজেটের আগে বণিকসভার সাথে আলোচনা করি।' তাঁদের সাথে মালিকদের যে কোনদিনই কোন বিরোধ ছিল না তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্যোতিবাবু আরও বলেছেন, '১৯৭৭ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় আসি তখনই আমরা শ্রমিকদের জানিয়েছিলাম, মালিকদের বিরুদ্ধে শেষ অস্ত্র ধর্মঘট। আলোচনার টেবিলেই তাঁদের সাথে সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে।' অর্থাৎ দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করে মালিকদের মুনাফার ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁরা শ্রমিকদের নিষেধ করে দিয়েছিলেন। জ্যোতিবাবু তাঁর এই বক্তব্যের দ্বারা ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের আবারও এই আশ্বাস দিলেন যে, তাঁদের দলের নামের শেষে মার্কসবাদী লেখা থাকলেও, পতাকার রং লাল এবং তাতে কাস্তে হাতুড়ি আঁকা থাকলেও সত্যিসত্যিই তাঁদের থেকে মালিকদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয় যে তাঁদের নেই তা উদ্যোক্তারাও তাঁদের তিন দশকের অভিজ্ঞতায় খুব ভালোভাবেই বুঝেছেন। তাই উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিশিষ্ট শিল্পপতি কমল গান্ধী তাঁর স্বাগত ভাষণে বামফ্রন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, 'বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শান্ত পরিবেশ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে আমাদের ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা সরকারের সাথে আরও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই।' (দি স্টেটস্ম্যান, ৬/৪/০৪)

একথা আজ সকলেই জানেন যে, বামফ্রন্ট সরকার '৭৭ সালে শিল্পপতিদের যে কথা দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। গত তিন দশকে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত এ রাজ্যেও শ্রমিকশ্রেণী তথা সাধারণ মানুষের ওপর পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ কয়েকগুণ তীব্র হওয়া সত্ত্বেও সি পি এম তার বিরুদ্ধে কোন যথার্থ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেনি। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ নেয়নি তাদের শ্রমিক সংগঠন সিটুও। উপরন্তু যেখানেই শ্রমিকশ্রেণী তথা সাধারণ মানুষ তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে, সেখানেই বামফ্রন্ট সরকার মালিকদের রক্ষা করতে নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করেছে, শ্রমিক আন্দোলনে মালিকদের হয়ে দালালি করেছে, শ্রমিকস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকদের সাথে চুক্তি করেছে। ফলে মালিকরা যেমন অবাধে শ্রমিক ছাঁটাই করেছে, ইচ্ছামতো শিল্প-কারখানা বন্ধ করেছে, তেমনি শ্রমিকদের রক্ত জল করে উপার্জন করা প্রভিডেন্ট ফান্ডের শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।

সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু আজ শিল্পপতিদের সভায় সগর্বে ঘোষণা করতে লজ্জা পাচ্ছেন না যে, 'বণিক সম্প্রদায়কে আমরা গুরুত্ব দিই, বাজেটের আগে বণিকসভার সাথে আলোচনা করি।' অথচ উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানের হাজার হাজার শ্রমিক যখন কাজ হারিয়ে বাঁচার রাস্তাটাও হারিয়ে ফেলেন; বন্ধ কারখানার ছাঁটাই শ্রমিক, ফসলের দাম না পাওয়া চাষী, বেকারির জ্বালায় জ্বলতে থাকা যুবক যখন আত্মহত্যা করেন, তা রোধ করতে বাজেটের আগে তাঁদের সাথে আলোচনায় বসতে এই 'মেহনতি মানুষের নেতাদের' দেখা যায় না। মেহনতি জনতার রক্তে রঞ্জিত পতাকার রং শিল্পপতিদের দেওয়া গোলাপে লাল করে নিতে আজ আর ওই নেতাদের কোনও কুণ্ঠা হয় না। ভরত জৈন, কমল গান্ধীর মতো শিল্পপতিরা অনায়াসে 'পার্টি বান্ধব' হয়ে ওঠে। ব্রাত্য হয়ে যায় লক্ষ কোটি রামা কৈবর্ত, রহিম শেখেরা। চাষে সর্বস্ব খুইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষরা আত্মহত্যা করলে এই নেতারাই তাঁদের চরিত্রের দোষ খোঁজেন। মালিক-শিল্পপতিদের আলাদা সভা ডেকে শ্রমিক আন্দোলন বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেন, শত শত কোটি টাকা করছাড় ঘোষণা করেন আর শ্রমিকদের সভায় গিয়ে মালিকদের মুণ্ডপাত করেন, শ্রমিক-কৃষকের দুঃখে চোখের জল ফেলেন। সি পি এমের এই দ্বৈত চরিত্র আজ আর কোনভাবেই ঢেকে রাখা যাচ্ছে না।

অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতোই যেকোন প্রকারে হোক ক্ষমতার অলিন্দে আজ সি পি এমের প্রবেশ করা চাই। তার জন্য বুর্জোয়া যেকোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে আজ তারা প্রস্তুত। আজ যেখানে প্রয়োজন ছিল পুঁজিপতিশ্রেণীর এই সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করা, সেখানে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে এই আক্রমণের মুখে নিক্ষেপ করে মালিকদের সাথে একত্রে খানাপিনা এবং প্রমোদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে।

এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়ী করুন

একের পাতার পর

রাজ্যের থেকে কোন অংশে এরা পিছিয়ে নেই।

আজ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার আওয়াজ তুললেও কেন্দ্রে বিজেপির সাথে জোট বেঁধে ভি পি সিং সরকারকে এরাই সমর্থন করেছে, দু'জন বিজেপি কাউন্সিলারের সমর্থন নিয়ে কলকাতা পুরসভা পরিচালনা করেছে, কলকাতা ময়দানে বাজপেয়ীর সাথে যুক্ত সভা করেছে।

বাস্তবে সি পি এম দলটিও বুর্জোয়া দলগুলির মতোই গদিসর্বস্ব রাজনীতির মাধ্যমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান আদর্শকে কলঙ্কিত করে চলেছে। ফলে জনগণের সমর্থন চাওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার এদের আছে বলে আমরা মনে করি না। এই সি পি এম, কংগ্রেসকে সাথী করে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জোট গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। অথচ এদেশের মানুষ জানেন যে, কংগ্রেসীরাই ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজনে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে, জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, এই দলের প্রয়াত নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী 'গরিবি হঠাও' স্লোগানের আড়ালে এদেশের মানুষের জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। এদের এই রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা জনগণ বিচার করে দেখবেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে সিপিএম বিরোধী মানসিকতাকে পুঁজি করে ভোটের আসরে বাজিমাৎ করতে চাইছে। এদের না আছে কোনও নীতি, না আছে কোনও কর্মসূচি। যেন তেন প্রকারেণ কেন্দ্রে বা রাজ্যে মন্ত্রী হতে পারাটাই এদের মূলমন্ত্র। তাই কখনও বিজেপি, কখনও বা কংগ্রেস, আবার কংগ্রেসকে ছেড়ে বিজেপির সাথে গাঁটছড়া বাঁধার মধ্য দিয়ে এদের অস্থির দিশাহীন রাজনীতি প্রমাণিত হয়েছে। আরও বিপজ্জনক দিক হল, এই তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁধে চেপে এ রাজ্যে অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি জমি করে নিতে পারছে।

এই নির্বাচনে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম — যে প্রতীকেই লড়াই করুক না কেন, আসলে এরা সকলেই শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং আজ্ঞাবহ।

আমরা মনে করি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্তি ঘটে না। এই নির্বাচনে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম — যেই জিতুক না কেন, তাতে জনগণের পরাজয়ই সূচিত হয়। লাভবান হয় একচেটিয়া মালিক সম্প্রদায়। নির্বাচনে সরকারের বদল হয়, শোষণমূলক ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নির্বাচন নয়, গণআন্দোলনই আজকে শোষিত মানুষের বাঁচার পথ। একমাত্র আমাদের দল এস ইউ সি আই এদেশে শোষিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে, জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে তুলছে। এসব আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে আমাদের কর্মীরা প্রাণ দিচ্ছেন, রক্ত ঝরাচ্ছেন, কারারুদ্ধ হচ্ছেন। আমাদের আন্দোলনের চাপেই এরাজ্যে সিপিএম-সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবহণের ভাড়া, হাসপাতালের বর্ধিত চার্জ কমাতে বাধ্য হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে মন্ত্রীত্বের ঠাণ্ডা ঘর নয়, উত্তপ্ত রাজপথে গণআন্দোলনই মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ।

নির্বাচনের পরে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, আজ যারা জনগণের দুঃখে চোখের জল ফেলছে, তারাই পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়াবে, ওষুধপত্র, বিদ্যুতের দাম, পরিবহণের ভাড়া বাড়াবে। পঞ্চায়েত ও অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে ট্যাক্স বসাবে। ফলে জনজীবন এক সর্বাত্মক আক্রমণের শিকার হবে।

ফলে এই নির্বাচনে জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তাঁরা গদিসর্বস্ব মালিকশ্রেণীর সেবাদাস বুর্জোয়া বা মেকি বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করবেন, নাকি গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধিতে এগিয়ে আসবেন।

আমরা এরাজ্যে ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছি। আমরা জনগণের বিশ্বাস ও আস্থাকে পাথেয় করেই এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, বহু গণআন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবাংলার জনগণ আগামী দিনে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের সমর্থনে এগিয়ে আসবেন।

‘মা-ই আমায় লড়াই করতে শিখিয়েছেন’

আমেরিকার বাল্টিমোর প্রদেশের ‘সিটি হল’-এর সামনে গত ৯ মার্চ স্কুলে অর্থসাহায্য ক্রমাগত কমিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়েছিল ১০০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী ও তাদের সমর্থকরা। সেখান থেকে প্রাণবন্ত এক মিছিল মেরিল্যান্ডে শিক্ষাদপ্তরে পৌঁছায়। মুখে তাদের স্লোগান — ‘ আমাদের টাকা ফেরত চাই’, ‘কারাগার নয়, শিক্ষা চাই, ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় রাস্তায় সাধারণ মানুষের কাছেও তাদের বক্তব্য পৌঁছে দেয়। শহরের মেয়রের নিষেধ এবং চোখ রাঙানিকে ভয় পায়নি তারা। ছাত্রছাত্রীদের একটি সংগঠন ‘অ্যালজেব্রা প্রোজেক্ট অ্যান্ড দি ম্যাথ লিটারেসি ওয়ার্কার্স’ একদিনের যে স্কুল-ধর্মঘট ডেকেছিল, তাকে সমর্থন করে ক্লাস বয়কট করে ওখানকার ১০টি হাইস্কুলের ছেলেমেয়েরা। ৯ তারিখের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে সংগঠনটির ছাত্রছাত্রীরাই। বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের মানুষজন তাদের এই কার্যক্রমকে সমর্থন জানান।

বাল্টিমোরে স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি সাহায্য ছাঁটাই করায় ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। শিক্ষকদের বিনা-বেতনে লম্বা ছুটি নিতে বাধ্য করছে কর্তৃপক্ষ। তাদের বেতনও কেটে নেওয়া হচ্ছে।

ছাত্রদের দাবি ছিল ‘থর্নটন অ্যাক্ট সেটলমেন্ট’ কার্যকর করতে হবে। আদালতের একটি নির্দেশকে ভিত্তি করেই এই মীমাংসা সূত্র তৈরি হয়েছিল। ছাত্র পিছু সরকারি অর্থসাহায্যের পরিমাণ গরিব ও ধনী উভয় ধরনের স্কুলেই যাতে সমান হয়, সেজন্য আদালত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। এজন্য গরিব স্কুলগুলির ক্ষেত্রে বছরে বাড়তি ২৬০ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য সরকারের দেওয়ার কথা, যা সরকার দিচ্ছে না। এই দাবিতেই গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা মেরিল্যান্ডের রাজধানী শহরে বিক্ষোভ দেখান।

আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের একজন নেত্রী ১৫ বছর বয়সী চ্যানটেল মোরান্ট এক শ্রমজীবী মায়ের সন্তান। তার মা মেরি মোরান্ট বাস-চালকের কাজ করেন। গভীর আবেগ ও গর্বের সাথে চ্যানটেল ‘সান’ পত্রিকাকে বলেছে, ‘‘মা-ই আমাকে আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করেছেন, তিনিই আমার প্রেরণা। তিনি গণআন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। মা-ই আমাকে মানুষের দাবি নিয়ে লড়তে শিখিয়েছেন।’’

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চ্যানটেলরা মানুষকে বলছে — গত ১০ বছরে যুদ্ধের পিছনে মার্কিন সরকার কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছে, ইরাকে দখলদারির জন্য ৮ হাজার ৭০০ কোটি ডলার সম্প্রতি সরকার বরাদ্দ করেছে। এই অর্থ যদি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হত, তাহলে কত ভাল স্কুল তৈরি হতে পারত, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থাও করা যেত।

(ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ২৫-৩-০৪)

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

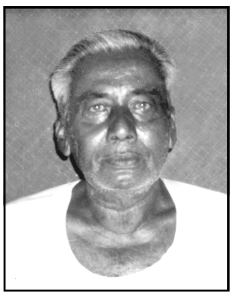

পুরুলিয়া জেলার এস ইউ সি আই-এর নডিহা সুরুলিয়া লোকাল কমিটির বিশিষ্ট সদস্য, সারা ভারত কৃষক খেতমজুর সংগঠনের নিরলস কর্মী ও সদা হাস্যময় কমরেড শক্তিপদ মাহাত গত ২০ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিড্‌নির অসুখে ভুগছিলেন।

কমরেড শক্তিপদ মাহাত ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে দলের সাথে যুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দলীয় কাজকর্মের সাথে আবেগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমরেড মাহাত মৃত্যুর পূর্বে তাঁর একমাত্র পুত্রকে বলে গেছেন — ‘‘আমি এখানে দলকে গড়ে তুলেছি, তুইও এই দলকে আজীবন রক্ষা করবি।’’

২৫ মার্চ কমরেড শক্তিপদ মাহাত স্মরণে তাঁর বাড়ি কালুহারে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড গঙ্গাধর মাহাত ও নলিনীরঞ্জন মাহাত কমরেড শক্তিপদ মাহাত’র সংগ্রামী জীবনের বিরল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড ভাস্কর ভদ্র এবং জেলা কমিটির বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড ডি কে মুখার্জী। তাঁরা কমরেড শক্তিপদ মাহাত’র জীবন সংগ্রামের ধারাকে অব্যাহত রেখে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কমরেড শক্তিপদ মাহাত লাল সেলাম

ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেবের শহীদ দিবস পালন

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার অমর শহীদ ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেবের ফাঁসির দিন ২৩ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ সপ্তাহটিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ হিসাবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে তিনটি গণসংগঠন ডি ওয়াই ও, ডি এস ও, এম এস এস-এর যৌথ উদ্যোগে উদযাপিত হয়। ২৩ মার্চ সকালে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে শহীদ বেদীস্থাপন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মারকব্যাজ পরিধান, পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিকালে বালুরঘাট শহরের কমিউনিটি হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুদীপ্ত তরফদার। স্পন্দন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভার মূল বক্তা ডি ওয়াই ও’র রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক ব্যানার্জী তার বক্তব্যে এই তিন শহীদের জীবন সংগ্রামের ও চরিত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে যুব তথা জনজীবনের সর্বগ্রাসী সঙ্কটের সমাধানে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরিশেষে সভাপতি তার ভাষণে সমাজের বর্তমান অবক্ষয়ী সংস্কৃতি, মূল্যবোধহীনতা, আদর্শহীনতার বিরুদ্ধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

রায়গঞ্জ

গত ২৩ মার্চ সারা রাজ্যের সাথে সাথে রায়গঞ্জেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার অন্যতম প্রতিনিধি শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং এর ৭৪তম শহীদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, ও যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালিত হয়। রায়গঞ্জ শহরে স্থানীয় বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশে সকাল ৭টায় শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পর সারাদিন ভগৎ সিং-এর প্রতিকৃতি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান করা হয়। বিকালে আলোচনা সভায় ভগৎ সিং-এর জীবনী ও বর্তমান সমাজে ভগৎ সিং-এর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা এই বিষয়ের উপরে প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে আলোচনা হয়। এস ইউ সি আই-এর উত্তর দিনাজপুর জেলার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বিনয় মল্লিক এবং ডি ওয়াই ও’র জেলা কমিটির বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বিপ্লব কর্মকার আলোচনা করেন।

স্বনিযুক্তি সমিতির উদ্যোগে মগরাহাটে ব্যাঙ্ক ডেপুটেশন

গত ৯ মার্চ ইউ বি আই মগরাহাট শাখায় ঋণ-পরিশোধ শিবিরে ঐ থানার বিভিন্ন স্তরের লোনীদের ডাকা হয়েছিল। তাদেরকে পাঠানো চিঠিতে ব্যাঙ্ক প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, উক্ত শিবিরে প্রত্যেক লোনীকে বকেয়া লোনের সিংহভাগ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে এবং অতি সত্ত্বর ঋণের বকেয়া অংশও ফেরৎ দিতে হবে, নচেৎ প্রত্যেক লোনীর বিরুদ্ধে কোর্ট কেস করা হবে ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরই বিরুদ্ধে আলিদহ ব্লকের লোনীদেরকে সমবেত করে, ঋণ আদায়ের শিবির চলাকালীন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সমিতির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি দীপক ব্যানার্জী। প্রতিনিধি দলে এ ব্যাতীত ছিলেন ব্লক সম্পাদক মলয় বারিক, ব্লক কমিটির সদস্য চন্দন মণ্ডল ও নির্মল মণ্ডল। সমিতি প্রদত্ত স্মারকলিপি নিয়ে দীর্ঘকাল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে কথাবার্তা চলার পরে উনি সমিতির বক্তব্যের যথার্থতা ও বাস্তবতা স্বীকার করে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার আশ্বাস দেন। সমিতি প্রদত্ত স্মারকলিপিটি ব্যাঙ্কের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচারের জন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

ত্রিপুরায় শহীদ ভগৎ সিং দিবস পালন

শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর ৭৪তম শহীদ দিবসে আগরতলায় ২২ মার্চ তিন শতাধিক ছাত্রের এক সুসজ্জিত সাইকেল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বিভিন্ন অঞ্চলে শহীদ বেদী স্থাপন ও মাল্যদান করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি হয় বটতলায়। এখানকার সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শিক্ষক নিধুভূষণ হাজরা, অরুণ ভৌমিক, বাবুল বণিক।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুরে শহীদ বেদী স্থাপন করা হয়। থানা চৌমূহনীতেও এই অনুষ্ঠান হয়। বিকালে একটি সাইকেল র‍্যালি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে শহীদবেদী স্থাপন, মাল্যদান ও ব্যাজপরিধান হয়।

ত্রিপুরায় ছাত্র আন্দোলন

ত্রিপুরায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি এবং অঙ্কের প্রশ্ন বিগত বছরগুলির প্রশ্ন থেকে সম্পূর্ণ অন্যধরনের হওয়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা অত্যন্ত বিপাকে পড়ে। এর প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও’র ত্রিপুরা অর্গানাইজিং কমিটির উদ্যোগে শতাধিক ছাত্রছাত্রী মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল পর্ষদ সচিবের সঙ্গে দেখা করে দাবি জানায় — (১) এবারের ইংরেজি ও অঙ্ক উত্তরপত্র শিথিল ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, (২) পর্ষদ অনুমোদিত সম্পূর্ণ সিলেবাস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে শেষ করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে এমনভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে যেকোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর ছাত্ররা দিতে পারে, (৩) অবিলম্বে শিক্ষার মান বিনষ্টকারী ‘নোডাল ব্যবস্থা’ প্রত্যাহারের জন্য পর্ষদকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ আই ডি এস ও এবারের এই ঘটনার জন্য নোডাল ব্যবস্থাকে দায়ী করে। নোডাল ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রী বই না পড়ে ‘কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে’র উপর নির্ভর করেছে, যেখান থেকে ১০০ শতাংশ প্রশ্ন আসার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল।

ট্রেনের স্বল্পমূল্যের টিকিট আদায়ে সফল হলেন পরিচারিকারা

নরেন্দ্রপুর ও সোনারপুরের পরিচারিকাদের ট্রেনের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিটের দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলন সফল হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল ২৫ টাকার টিকিট কাটতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন।

অন্যান্য এলাকার মতো এই এলাকার পরিচারিকারাও প্রতিদিন স্পেশাল চেকিং গাড়ি ‘চেতনা’ ও স্টেশন চেকারদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত, শারীরিকভাবে নিগৃহীত এবং অর্থদণ্ডের শিকার হচ্ছিলেন। অথচ আইনত প্রাপ্য স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট তাঁরা পাচ্ছিলেন না। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন স্থানীয় সমাজসেবী জয়শ্রী ভট্টাচার্য। তিনি সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সাথে যোগাযোগ করেন। সমিতির সম্পাদিকা পুষ্প পাল এবং সোনারপুর শাখার ইনচার্জ রাধা মিত্রের যৌথ উদ্যোগে এবং বাবলু হালদার প্রমুখ স্থানীয় যুবক ও জনগণের সহযোগিতায় দীর্ঘ চার মাস ধরে বার বার বিডিও অফিসে যোগাযোগের পরে দাবি আদায় করা সম্ভব হয়, নরেন্দ্রপুর ও সোনারপুরের প্রায় শতাধিক পরিচারিকা ২৫ টাকার মাসিক টিকিট কাটতে সমর্থ হন।

এক বিজয় সমাবেশে পরিচারিকারা সমিতিকে আরও শক্তিশালী করার এবং পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, বার্ধক্যভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিনামূল্যে সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনে যোগ দেবার লিখিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ভোট দিন

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৯ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, ভোটের পরেই বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনার পরিকল্পনা চলছে। রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে সেই আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। ভোটের পরেই বিদ্যুতের মাশুল গড়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হতে যাচ্ছে। কোড ও রেগুলেশান তৈরি করে তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দিয়ে অভিন্ন মাশুল চালু করতে যাচ্ছে। এমনকী আইন-বিরুদ্ধভাবে ৬২(৩) ধারাকে নতুন ব্যাখ্যা দিতে চলেছে। যার ফলে হাইকোর্ট স্ল্যাব রাখার পক্ষে যে রায় দিয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং রাজ্যের গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ক্ষেত্রে, কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে বিদ্যুতের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিদ্যুতের দাম কমে যাবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিদ্যুতে ভর্তুকি তুলে দেবার কথা ঘোষণা করেছে।

এর ফলে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও পিছিয়ে-পড়া মানুষের উপর এক চরম আঘাত নেমে আসবে। ক্ষুদ্র শিল্প আরো ব্যাপক হারে বন্ধ হবে। আরো ব্যাপক হারে চাষী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।

তিনি বলেন, ভোট পাওয়ার জন্য ক্ষমতালোভীরা বহু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু ভোট ফুরালে এরা সকলেই বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে এই আক্রমণ নামিয়ে আনবে। তাই একদিকে গ্রাহকদের এখন থেকেই ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। অপরদিকে প্রতিটি দল ও প্রার্থীকে বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ ও আগামী দিনের আক্রমণ প্রতিরোধে আন্দোলনে যোগ দেবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দাবি করতে হবে। এই লিখিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে রাজ্যের ভোটারদের ভোট দেবার জন্য তিনি আবেদন জানান।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলী বলেন, আইন করা হয়েছে বিল বাকি থাকলে দেড়মাসের পরে লাইন কাটা হবে। কিন্তু কমিশন বলছে, গ্রাহকদের তিন মাসের সিকিউরিটি দিতে হবে যাতে লাইসেন্সি কোটি কোটি টাকা অতিরিক্ত লুণ্ঠন করতে পারে।

তিনি বলেন, প্রমাণ ছাড়া লাইন কাটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এই স্বৈরাচারী ক্ষমতা বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিয়ে বেআইনিভাবে কোটি কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব বন্ধ না হলে সি ই এস সি এবং বিদ্যুৎ পর্ষদ ঘেরাও করা হবে।

আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল রাজ্যের সব বিদ্যুৎ অফিসে বর্ধিত সিকিউরিটি আদায় ও প্রমাণ ছাড়া লাইন কাটার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানো হবে। লোকসভা ভোটের পরে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক থেকে দূর হঠো

গত বছর ৯ এপ্রিল বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে মার্কিন-ব্রিটিশ বাহিনী ইরাক দখল করে। কিন্তু ভাঙতে পারেনি ইরাকি জনগণের সংগ্রামী মনোবলকে। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের সম্মিলিত সমরশক্তিকে আজ পিছু হঠতে বাধ্য করছে ইরাকি গণপ্রতিরোধ। ইরাকের সেই বীর জনগণকে অভিনন্দন ও বিজেপি পরিচালিত ভারত সরকারের মার্কিন ঘেঁষা অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং ইরাক থেকে অবিলম্বে সমস্ত মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ও সাদ্দাম হোসেনের মুক্তির দাবিতে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১২ এপ্রিল এক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড, জওহরলাল নেহরু রোড ধরে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে যায়। গোটা পথ ধরে সহস্র কণ্ঠের উদ্দীপ্ত স্লোগানে আওয়াজ ওঠে 'মার্কিন দখলদার বাহিনী ইরাক থেকে হাত ওঠাও', 'সাদ্দাম হোসেনের মুক্তি চাই', 'ইরাকে ভারতীয় সেনা পাঠানো চলবে না', 'ইরাকি গণপ্রতিরোধ দীর্ঘজীবী হোক।' মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। মিছিল মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হলে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে বুশ-ব্লেয়ারের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন কমরেড মানিক মুখার্জী।

লক্ষ্ণৌয়ের ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই

— কমরেড নীহার মুখার্জী

বিজেপি নেতা লালজি ট্যান্ডনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে, সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত ভীড়ের চাপে ২১ জনের মৃত্যু এবং শত শত আহত হওয়ার ঘটনায়, যাদের অধিকাংশই ছিলেন গরিব মহিলা — এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১২ এপ্রিল, ২০০৪ এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করে বিজেপি নেতাদের এ ধরনের অনুষ্ঠান — যার প্রকৃত উদ্দেশ্য দরিদ্র অসহায় মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করা — তার তীব্র নিন্দা করেছেন কমরেড মুখার্জী।

তিনি পুরো ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

সি পি এমের মিত্র কংগ্রেসের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'!

এবারের লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জোরালো হুঙ্কার ছাড়ছে সি পি এম, দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টারে জ্বলজ্বল করছে লেখা — 'দেশ বিপন্ন', 'ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন' এবং এই বিপন্নতার হাত থেকে দেশ উদ্ধারের উপায় হিসাবে তারা 'বিজেপি হঠাও'-এর ডাক দিয়েছে। এ কাজে আজ তাদের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু হল কংগ্রেস। এমনকি পরিস্থিতি তৈরি হলে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রীসভায় যোগ দিতেও গররাজি নয় সি পি এম।

সি পি এমের এহেন 'ধর্মনিরপেক্ষ' বন্ধুটির ধর্ম-নিরপেক্ষতার স্বরূপ বুঝতে সাম্প্রতিক মাত্র দুটি ঘটনার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। দুটি ঘটনাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম ঘটনাটির দিকে চোখ ফেরানো যাক। গত ১৪ মার্চ ২০০৪ 'দি হিন্দু' পত্রিকায় একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে 'আশীর্বাদ মহোৎসব' নামে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন সৎগুরু মাতা অমৃতানন্দময়ী দেবী 'আম্মা'। তাঁর পাশে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেত্রী উমা ভারতী এবং 'আম্মা'র পায়ের কাছে ভক্তি বিনম্র ভঙ্গিতে প্রণাম নিবেদন করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন অন্য কেউ নয়, স্বয়ং সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং।

দ্বিতীয় ঘটনাটি পাঞ্জাব রাজ্যের। প্রকাশিত হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৪ 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়। সেখানে সাধু-সন্ন্যাসী-গুরু মহারাজদের খুশি করে ভোটের ঝুলি ভরাতে তাঁদের আখড়ায় আখড়ায় ধর্না দিতে শুরু করেছেন কংগ্রেসী নেতারা। বাবাজীদের সাহায্য পেলে ভোটে তাঁদের শিষ্যদেরও সমর্থন পাওয়া যাবে, তাই সে রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং এ ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন শিরোমণি অকালি দল বা বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে। সরকারে থাকার সুবাদে কংগ্রেস পাঞ্জাবে রীতিমত পুলিশ পাহারা বসিয়ে রেখেছে সাধু-সন্তদের ডেরাগুলিতে যাতে এঁদের 'কৃপাকণা' চুরি করে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভোটবাক্স ভরিয়ে না ফেলতে পারে।

এই হল সি পি এম কথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' শক্তির শক্তিশালী স্তম্ভ কংগ্রেস দলটির প্রকৃত চেহারা। আর এ হেন কংগ্রেস দলটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেই সি পি এম ধর্মনিরপেক্ষ জোট গঠনে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। অথচ আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সি পি এম দলটির কাছে বার বার সহযোগিতা চাওয়া সত্ত্বেও তারা সে অনুরোধে কর্ণপাত করেনি। আসলে দেশের সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত ভুলে সমস্ত মানুষকে সংগঠিত করে শক্তিশালী ও লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা নয়, সি পি এমের চাই পরিষদীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব। এর জন্য কংগ্রেস এখন তাদের কাছে গাছে ওঠার মই বিশেষ। তাই সেই দলটির অতীতের দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ভূমিকা বা আজকের এই ''নরম হিন্দুত্বের'' চেহারাটি সি পি এম নেতৃত্ব দেখেও না-দেখার ভান করছেন। ফলে এদেশে আজ ধর্মনিরপেক্ষতা যে সত্যিই বিপন্ন — এ ব্যাপারে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনই সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করার নামে সি পি এমের এই তর্জন-গর্জন যে নেহাতই শূন্যকুম্ভের আস্ফালন মাত্র — তাও পরিষ্কার।

আর একটা কথাও অবশ্যই বোঝা দরকার, তা হচ্ছে, কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে ক্ষমতার অলিন্দে থেকে আজকের চরম সঙ্কটগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের যারা সেবা করে চলেছে তাদের নাম এবং রং যাই হোক, তারা কেউই জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে আলাদা থাকতে পারেনা।

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে
কলকাতা জেলা কমিটির আহ্বানে

সমাবেশ

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল বিকাল ৫টা
বক্তা ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী
সভাপতি ঃ কমরেড কালিকা মুখার্জী

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net